***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***UGC Enlisted Serial No. 48666***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 142-149*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসে স্বতন্ত্র নারী

সুরজিত পাখিরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

*Abstract*

*Jyotirmoyee Devi occupies a unique position among Bengali novelists. Readers get mesmerized to read her works. Her works mark a note of venture and courage in contemporary society, especially in context of woman centric questions that she rises. She aimed at achieving the rights of women education, their fulfil went of life and women's all round development.*

*She thought about the spectrum of women's ever present problems and gave expression to these sincerely. She pained to see helplessness and lack of rights in family life and hence her novels give vent to deprived women characters as well as highly personalized female characters.*

*Through the ages women with a sense of individuality, have tried to break the shackle of dependence upon others . But women have remained confined to four walls of domestic life. Owing to family pressure, disgrace, defamation and obstacles by the head leaders of society. The independent heroines created by Jyotirmoyee Devi have tended to change the definition of womanhood. Her highly individualized, independent female characters such as Supriya, Bina, Sutara, Bishakha,Sukhmotia are educated, independent and not subordinate to male.*

*Patriarchial Society always tend to look and take as parasites. But the educated, self dependent female characters in Jyotirmoyee Devi's novel depart from parasistic living to desire of individual location. None of them have loved male with a sense of individuality intact. All of them decided their own fate before they enter the conjugal with their husbands.*

*These independent female characters have kept themselves aloof from lust for money and males having lust for women. Jyotirmoyee realized that women may be self dependent only by virtue of education. The independent women characters have lived not by being pious women, but by being helpmate in time of weal and woe with an absolute note of human identity.*

***Key words: Female education, individuality, sense of independence, self-dependent, helplessness.***

ভূমিকাঃ বাংলা কথাসাহিত্যে বিশ শতকের মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্থান সমুজ্জ্বল। তিনি উনিশ শতকের শেষ দশকে ১৮৯৪ সালে রাজস্থানের জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ের নারীরা শিক্ষার আলো না পেলেও, জ্যোতির্ময়ী কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিলেন। বাংলা, হিন্দি শেখানোর জন্য তাঁদের বাড়িতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছিল। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার কিরণচন্দ্র সেনের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়ী শাশুড়ী, ননদদের লুকিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অন্তরালে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। স্বামী কিরনচন্দ্রও তাঁকে ইংরাজী শেখাতেন। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। স্বামী মৃত্যুর পর তিনি মানসিকভাবে একাকীত্ববোধ করতে থাকেন, যদিও তাঁর পিতৃগৃহে ছিল নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্রয়।

স্বামী মৃত্যুর কিছুদিন পর মানসিক একাকীত্বকে কিছুটা দূরে সরিয়ে একান্তে কিছু লেখালেখি করতে তিনি চেষ্টা করেন। অনন্ত বেদনার মধ্যে আপন বেদনাকে যুক্ত করে দিতে তিনি চেয়েছেন। আপন ধারণাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার ইচ্ছার জন্যই তিনি সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯২১ সালে তাঁর 'অতিথি' কবিতা প্রকাশ পায়। এই পত্রিকার পরের সংখ্যায় 'নারীর কথা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পাঠকসমাজ তাঁর লেখা পাঠ করে বিস্মিত হয়। বিশেষতঃ নারীকেন্দ্রিক কিছু প্রশ্ন রাখা একজন মহিলা সাহিত্যিকের পক্ষে তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। এইরকম একটি প্রশ্ন হল-

> "যাঁরা কখনও নিজের সামান্য অভাব ত্রুটির কথাটাও মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যাঁরা সমাজের উৎপীড়ন অত্যাচারকে বিধাতার আশীর্বাদের মতো মাথা পেতে নেন, নিজেদের মানসিক, শারীরিক কোনো কষ্টই গ্রাহ্য করেন না, তবু আপনাদেরই বাপ, আপনাদেরই কোলে করে মানুষ করা ভাই, পতিদেবতা (হোন বা না হোন) আপনাদেরই বুকের স্নেহধারা দিয়ে লালিত পুত্র সকলের কাছেই উৎপীড়িত হন না কি?"।[১]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর আপন জীবন- যন্ত্রনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই যন্ত্রনাকে প্রশমিত করতে চেয়েছেন। সংসারের নানা কাজের ফাঁকে তিনি রচনা করেছেন অজস্র ছোটগল্প- প্রবন্ধ- কবিতা- উপন্যাস। সাহিত্যসৃষ্টির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে তিনি পান 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক'।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তিনি ১৯৮২ সালে পান 'হরনাথ ঘোষ স্মৃতিপদক'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সোনা রূপা নয়' গল্প গ্রন্থের জন্য তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' সম্মানিত করেন।

সাহিত্যসৃষ্টি ছাড়াও সমাজসেবামূলক নানা কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় বসবাসকালীন ১৯২৭-২৮ সালে তিনি AIWC-র (**ALL INDIA WOMEN'S CONFERENCE**) কলকাতা শাখার সদস্যা হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে **AIWC**-র কলকাতা শাখার তিনি সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হন। নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি **AIWC**-র কমিটির উদ্যোগে অনেক সম্মেলন, আলোচনাসভা পরিচালনা করেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী দীর্ঘ ষাট বছর ধরে লেখালেখি করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে কাহিনীর ঘটনাস্থল পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে রাজস্থান, বারাণসী বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনও শহর পর্যন্ত পৌঁছেছে। পুরুষ-নারীর অবস্থানের বৈষম্য তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে। তিনি চেয়েছেন নারীজীবনের পূর্ণতা, নারীশিক্ষার অধিকার, নারীদের সার্বিক উন্নতি। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি শিক্ষিত ও আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল।

১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বর জ্যোতির্ময়ী দেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বর্তমান প্রবন্ধের ভাবনা জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসে নারীস্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। 'ছায়াপথ' উপন্যাসের সুপ্রিয়া, 'বৈশাখের নিরুদেশ মেঘ' উপন্যাসের বীনা,'মনের অগোচরে' উপন্যাসের বিশাখা,'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের সুতারা, 'হরিজন উন্নয়ন কথা' উপন্যাসের সুখমতিয়া- চরিত্রগুলি বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্বতন্ত্র নারী চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে 'সংবাদ বাঙালী চরিতাভিধানে' (দ্বিতীয় খন্ড) লেখা হয়েছে—

"নারীর চিরন্তন সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে তিনি ভেবেছেন এবং রূপ দিয়েছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। বাস্তবের প্রেক্ষাপটে সংসারে মেয়েদের অসহায়তা। অধিকারহীনতা তাঁকে পীড়িত করেছে। তাই তাঁর উপন্যাসে বঞ্চনাপীড়িত নারীচরিত্রের পাশাপাশি ফুটে উঠছে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র"।[২]

উপন্যাসে নারীর স্বতন্ত্রতাঃ জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'ছায়াপথ'। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ১৯৩২-৩৩ সালে ধারাবাহিকভাবে 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ঔপন্যাসিক উপন্যাসের নাম দেন 'ছায়াপথ'। উপন্যাসটিতে মোট ছাব্বিশটি পর্ব আছে।

পণপ্রথা এবং কন্যাদায় 'ছায়াপথ' উপন্যাসে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া বিবাহে পুরুষের পণ নেওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে বলেছে- ".....আমাকে বাংলাদেশের পাত্রদের- সৎপাত্রদের কনে দেখিয়ে বিয়ে দিতে আর পারবে না। আমার মনে হয়, যাদের সঙ্গে তোমরা আমাদেরে বিয়ে দাও, ওরা পুরুষমানুষ নয়।..... আমার পক্ষে ঐ ধরনের পাত্রীত্ব বা মাতৃত্ব দুয়ের একটিও আর সম্ভব হবে না। কেননা আমি মন যোগাতে পারব না।..... নিজেদের মনের দারিদ্র্য এত বেশি যে, ধন দিয়েই ওরা তা পূর্ণ করতে চায়"।[৩]

সুপ্রিয়া বাগদত্তা ছিল শিক্ষিত অজিত ও তার পরিবারের কাছে, ¢L ¿¹¥ ধনী পরিবারের কন্যা প্রতিভাকে পেয়ে তারা বিয়ের প্রস্তাব অস্বীকার করে। শেষ অবধি তার দাদা তারকের বন্ধু বিভাসের ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে সে বিবাহ করে। বিভাসকে বিবাহ করলেও শিক্ষকতার চাকরি সে ছাড়েনি। বিবাহে তার শর্ত ছিল- চাকরি সে ছাড়বে না। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিভাস বুঝতে পারেনি, কেন সুপ্রিয়া বিদেশে একলা পড়ে আছে, যখন তার সংসারে সুপ্রিয়ার অর্জিত অর্থের কোনো দরকারই নেই। বিভাস রাগান্বিত হয়ে সুপ্রিয়াকে বলেছে-

"তার মানে তোমার দরকার আর তোমার মতই আমাকে মানতে হবে, এই তো"?"[৪]

উপন্যাসের অন্তিমে পৌঁছেও পাঠক উপলব্ধি করতে পারে না- সুপ্রিয়া কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? বিভাস স্ত্রী সুপ্রিয়ার ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়নি, বরং বিভাসের কণ্ঠে শোনা গেছে প্রেমিকের কাতর আবেদন-

"কাল চলো দুজনে তোমার ওখানে গিয়ে একটি ইস্তফার চিঠি দিয়ে তারপর মার কাছে যাব,যাবে?"[৫]

যে বেদনা, অপমান সুপ্রিয়ার জীবনকে সঙ্গীহীন করে দিয়েছিল, সেই সুপ্রিয়াকে ভালোবেসে জয় করে বিভাস।

সুপ্রিয়ার নীরবতা থেকে বোঝা যায়- তার উত্তর হ্যাঁ বা না যাই হোক না কেন, তাদের দাম্পত্য জীবন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করেছে।সুপ্রিয়ার এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাবলম্বী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। যে সুপ্রিয়াকে একসময় অর্থলিপ্সু পাত্রপক্ষ অপমান করেছিল, পরবর্তীকালে সেই সুপ্রিয়া স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এখন আর তাকে অসম্মান করার সাহস কেউ দেখায় না, কারও ক্ষমতা নেই তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করানোর।

পণপ্রথা, কন্যাদায় এই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হলেও উপন্যাসের অন্তিমে সুপ্রিয়া কন্যাদায় শব্দটাকেই মুছে দিতে পেরেছে। তার জীবনে ঘনীভূত হওয়া ঘটনা থেকে সে সত্য উপলব্ধি করেছে। সত্যটি হল- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে মনে করে পুরুষের ভোগ্যবস্তু। পুরুষের মনোরঞ্জনই হল নারীর মূল্যায়নের মাপকাঠি। যখন খুশি তাকে ছুঁড়ে ফেলা যায়, এই কাজের জন্য কোথাও কৈফিয়ত দিতে হয় না।

'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' উপন্যাসটি 'উত্তরা' পত্রিকায় ১৯৪৫-৪৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে উনিশটি পর্ব আছে। উপন্যাসটি রচনার প্রেক্ষাপটে

আছে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (১৯১৯-১৯৩০)। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন ও ডান্ডি যাত্রা করেছিলেন।

এই উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র প্রবোধ মুখুজ্যের কালো মেয়ে-বীণা। সে এম.এ পাস, চাকরিরতা। সে পিতার মৃত্যুর পর উপলব্ধি করেছিল- কালো হওয়ার জন্য বিবাহের বাজারে তার মূল্য সবচেয়ে কম। শিক্ষার গুণে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। নিজের মূল্য নির্ণয় করতে সে ঘর ছেড়েছে, ভেবেছে-

> "আমার দাম আমার কাছে যদি কিছু পাই"।[৬]

মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা বীণা স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব করেছে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে মূল্যের সমতা নিয়ে-

> "তার মনে হয় দামটা কিসের? টাকার তাহলে কি নয়? একটা ছেলে প্রফেসারের টাকা আর মেয়ে প্রফেসারের টাকার দামের তফাতটা কি?"[৭]

সামাজিক এই রীতিকে বীণার অদ্ভুত মনে হয়েছে, একে কটাক্ষ করে সে বলেছে.....

> 'একটা কালো কুৎসিত ছেলে যদি প্রফেসার হয়, তার দাম কি ¢L ¿¹¥ বিয়ের বাজারে কম হয় না'।[৮]

গান্ধীজির ডান্ডি যাত্রায় নীতিশের মতো বীণাও অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বীণার স্বনির্ভর হওয়ার লড়াই একসূত্রে বাঁধা হয়ে যায় ঔপন্যাসিকের ভাষায়- ".....মনে হয় মহাত্মাজি যেন নুনের রূপকে জানাচ্ছেন, আমাদের প্রতি গ্রাসের আহার্যে নুনের মতোই স্বাধীনতাও জীবনে অপরিহার্য। নুনহীন তরকারির মতো স্বাধীনতাহীন জীবনও বিষাদ"।[৯]

"মনের অগোচরে' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে ১৯৪২ সালে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রথম তিনটি অধ্যায়- 'বিশাখা', 'ললিতা সখী', 'যশোধরা' ছোটগল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি জ্যোতির্ময়ী দেবী উৎসর্গ করেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

উপন্যাসটিতে অধ্যায় আছে মোট পাঁচটি। অধ্যায়গুলি হল ''বিশাখা', 'ললিতা সখী', 'যশোধরা', 'গোবিন্দ', 'নারায়ণ, বেণু ও চন্দ্রা'। ঔপন্যাসিক প্রথমে এগুলিকে ছোটগল্পের আকার দিলেও পরে পঞ্চম অধ্যায় যোগ করে উপন্যাসের রূপ দেন। কলকাতা শহরের শিক্ষাব্যবস্থা ও আচার- ব্যবহারের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের একটি রক্ষণশীল পরিবারের নানা দিক থেকে পার্থক্যের ফলে যন্ত্রনাময় পরিস্থিতির উদ্ভবই হল উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু।

কলকাতার মেয়ে বিশাখার চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় রাজস্থানের এক শহরের বৈষব গোঁসাই পরিবারে। বিশাখা-ই এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র চরিত্র, যে জীবনে পরিবর্তন চেয়েছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সে যোগ্যতা দেখিয়ে পুরষ্কার পেয়েছে। এই আনন্দ তার দীর্ঘ স্থায়ী হয় নি, সে জানতে পারে রাজস্থানের গোঁড়া গোঁসাই পরিবারে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি সহ সেখানকার সমাজের গোঁড়ামি, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতায় সে দিশে হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে মেয়ে যশোধরাকে নিয়ে সে সংগ্রামের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘ ছয়- সাত বছর ধরে সে আদর্শের বোঝা বইতে গিয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। দীর্ঘ সময় পরে কলকাতায় পিত্রালয়ে এসে তার চেতনা জেগে উঠেছে। তার স্বগতোক্তিতে ধরা পড়েছে বেদনাময় অনুভূতি।-

> "দীর্ঘ পথের কষ্টের মাঝে বিশাখার শুধু মনে হয় সে যেন কোন নির্বাসিত জগতে বাস করে। এতদিন তো একথা তার একবারও মনে হয়নি। বারবার অতিশয় লজ্জিত ভাবে তার মনে হয় এ ভাবনা তার অন্যায়, বিশ্রী অনুচিত। তবু কেন অচেতন মনে জাগে কত কি যেন সে পায়নি"।[১০]

বিশাখা সত্যবাদী, তবু সব সত্য কথা বলার অধিকার তার নেই বৈষ্ণব গোঁসাই পরিবারে। সেই অব্যক্ত কথাগুলি তার মনের অগোচরেই রয়ে যায়। মেয়ে যশোধরাকে কলকাতায় রেখে পড়ানোর মধ্য দিয়ে সে মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছে। যশোধরা লেখা পড়ায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ইংরাজীতে সে লেটার পেয়েছে। যশোধরাকে লেখাপড়া শেখানোর মধ্য দিয়ে বিশাখা প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছে গোঁসাইবাড়িতে। তার দ্বিতীয় প্রতিবাদ হল যশোধরার বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়া। সে চেয়েছে মেয়ে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে কলকাতায় বিয়ে করবে। মেয়েকে কেন্দ্র করে বিশাখার এ লড়াইয়ে ফুটে উঠেছে নারীব্যক্তিত্ব, স্বপ্ন। সে মেয়ের মধ্য দিয়ে উন্মোচন করতে চেয়েছে বৃহৎ সম্ভাবিত দিগন্তকে।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটি ১৯৬৮ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি ১৯৬৭ সালে 'প্রবাসী পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় 'ইতিহাসে স্ত্রীপর্ব' নামে প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রকাশকের অনুরোধে উপন্যাসের নাম বদল করে রাখেন'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। উপন্যাসটিতে চারটি পর্ব আছে। ঔপানাসিক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন "সকল যুগের সকল দেশের অপমানিত লাঞ্ছিত নারীদের উদ্দেশযে"।[১১]

এই উপন্যাসের পটভূমিতে আছে ১৯৪৬ এর দাঙ্গা। সুতারা এই উপন্যাসের এক দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারের নারী- যে নিজের চোখে দেখেছে এক রাতে সারাজীবনের মতো হারিয়ে গেছে তার মা, বাবা আর দিদি। দাঙ্গায় নিজ পরিবারের সকলকে হারিয়ে সে অনাথ হয়ে যায়। দেশ বিভাগের দাঙ্গায় মুসলমানের হাতেই সে স্বজনহারা হয়, অন্যদিকে প্রতিবেশি মুসলমান তমিজসাহেব ও তার স্ত্রী তাকে আশ্রয় দিয়ে সুস্থ করে তোলে। তারপর সে কলকাতায় আপন আত্মীয়দের কাছে আসে। আত্মীয়রা কেউই তাকে আপন করে নিতে পারেনি, কেননা সে মুসলমানের সংস্পর্শে অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। কলকাতাবাসী কুটুম্বদের কাছে সে বোঝা হয়ে ওঠে। কুটুম্বরা আপন সংসারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাকে বাড়িতে আশ্রয় না দিয়ে মিশনারি বোডিং স্কুলে নির্বাসন পাঠায়। এই নির্বাসনই সুতারাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

পরবর্তী সময়ে স্কলারশিপ পেয়ে সুতারা বি.এ. পাস করে ইতিহাসে এম.এ. করে দিল্লির যাজ্ঞসেনী মহিলা কলেজে অধ্যাপিকার চাকরি পায়। কলেজে সুতারার সহকর্মী পাঞ্জাবের কৌশল্যাবতীও একজন উদ্বাস্তু। তার মুখ থেকেও সে শোনে দাঙ্গায় পাঞ্জাবিদের ওপরও অত্যাচার কম হয়নি। কৌশল্যাবতীর মুখে দাঙ্গার সময়য়ের নির্যাতনের ঘটনাগুলি শুনে সুতারা গভীর চিন্তাভাবনা করে-

মেয়েরা কি স্বাধীন হয়? কেউ কি ভাবে তার জন্য? ¢L ¿¹¥

এ সুতাবার অনেক বয়স হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর যুগ- যুগান্তরের বয়স তার দেহে মনে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মিশে যাচ্ছে। অকারণে লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা নারীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে যেন সে মনে মনে"।[১২]

সুতারা 'রাজনৈতিক অভিশাপের প্রতীক' হয়েও স্বনির্ভর হওয়ার প্রবল ইচ্ছার জন্যই অভিশাপকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

'হরিজন উন্নয়ন কথা' উপন্যাসটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৯৭৪-৭৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় উপন্যাসটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশকালীন উপন্যাসটি 'হরিজন উন্নয়ন কোষ' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় উপন্যাসের নাম বদলে রাখা হয় 'হরিজন উন্নয়ন কথা'। জ্যোতির্ময়ী দেবী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন-

"এ যুগে অস্পৃশ্য অচ্ছুতদের হরিজন অভিধা দিলেন যিনি সেই মহাত্মা গান্ধীজির স্মরণে"।[১৩]

উপন্যাসের সূচনাতে নিবেদন অংশে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন- "চরিত্র কাল্পনিক, ¢L ¿¹¥ পটভূমি ১৯৪৯-৫৩ সালের দিল্লি ভাঙ্গী কলোনির সমাজের বাস্তব চিত্র"।[১৪]

উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক আরও জানিয়েছেন-

> "উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা ভাঙ্গী বা মেথর সমাজের- তাদের সুখ দুঃখ নৈরাশ্যবেদনাভরা জীবনকে যেভাবে দেখেছি, এ তারই গল্প"।[১৫]

দিল্লীর হরিজন কলোনি ও বাল্মীকি ভবনকে কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাসটিতে বাস্তব জীবন ও চরিত্রের সমন্বয় দেখা যায়।

ভারতবর্ষে জাতি- ধর্ম- বর্ণকে কেন্দ্র করে সমাজে অস্পৃশ্যতা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই অস্পৃশ্যতাকে নিম্নশ্রেনীর মানুষ অভিশাপের মতো মনে করেছে। অস্পৃশ্যতার বলি হয়ে সমাজের সমস্ত সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কিছু ভারতবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন এখনও হয়নি। এই অস্পৃশ্য ভারতবাসীদের গান্ধীজি ভালবাসতেন। এদেরই নাম দিয়েছিলেন তিনি 'হরিজন'। এদের কল্যাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করতে উদ্যোগী হন।

হরিজন কলোনির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু ভাঙ্গী বালক- বালিকা ও বয়স্ক নারী নিত্যদিন পড়াশোনা করে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গী ছেলেমেয়েদের জন্য নিধারিত আছে 'পহেলি', 'দুসরি' কিতাব এবং 'পহেড়া' মুখস্থ।¢L ¿¹¥ কোন মেধাবী ভাঙ্গী ছেলেমেয়ে এই নির্ধারিত পাঠ শেষ করার পরও আরও কিছু শিখতে চাইলে সে কোথায় সুযোগ পাবে? বর্ণহিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি তার স্থান হবে?

ভাঙ্গী সম্প্রদায়ের প্রথা ছিল নয়- দশ বছর বয়সে ছেলে- মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। শুধু তাই নয়, সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগেই তার পিতা- মাতা তার বিবাহ বিষয়ে অন্য পিতা- মাতার সঙ্গে মৌখিক কথাবার্তা পাকা করে রাখে।

এই প্রথাতেই রামসুখের সঙ্গে সুখমতিয়ার ও রামধারীর সঙ্গে ভারতীয়ার বিবাহ ঠিক হয়ে আছে। তাদের সমাজে কন্যাপণের রীতি চালু ছিল। প্রথা মেনেই ভারতীয়ার বিবাহ হয়ে গেছে। ¢L ¿¹¥ সুখমতিয়া বিবাহে রাজি হয়নি। কারণ সে লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে সে নার্সিং ট্রেনিং নেয়। ট্রেনিং শেষে সে মিশনারি হাসপাতালে কাজে যোগ দেয়। ভাঙ্গি সমাজের একজন মহিলা শিক্ষিতা হয়ে উপার্জন করবে – এটা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কাল্পনিক ব্যাপার ছিল। ভাঙ্গি সমাজের বাইরের লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার মনের সুপ্ত ইচ্ছা জেগে উঠেছে-

> "সুখমতিয়ার মনের কোণে কোণে ভিড় করেছে অভ্যাগতদের, অন্যান্যদের দীপ্ত সপ্রতিভ চেহারা কথাবার্তা ব্যবহার। কতকালের ঐতিহ্য ইতিহাসে ভরা সংস্কারে শিক্ষায় মার্জিত সে জীবন প্রবাহ।
>
> সে কি সুখমতিয়াদের জন্য নয়?
>
> নেই কোথাও? কখনো আসবে না? ঐ আনন্দময় সফলতায় জেগে উঠবে না তাদের ভাই বোনদের রিস্তেদারদের সমাজ?"।[১৬]

পাঠকরা সুখমতিয়ার এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যেতে পারে না।

উপসংহারঃ- যুগ যুগ ধরে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত নারী পরাধীনতার শৃঙ্খল কেটে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। সমাজপতিদের বাধা, পরিবারের চাপ, নিন্দার জন্য নারী চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী থেকেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সৃষ্ট নায়িকা সুতারা জানতে চেয়েছে- 'মেয়েরা কি স্বাধীন হয়?' তাঁর সৃষ্ট স্বাধীনচেতা নায়িকারা পরিবর্তন করতে

চেয়েছে নারীজীবনের সংজ্ঞা, তাঁর স্বাধীনচেতা নারীচরিত্রগুলি একদিকে যেমন শিক্ষিতা, স্বাবলম্বী, অন্যদিকে তেমনই পুরুষমুখাপেক্ষী নয়।

পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে দেখতে ও পেতে চায় পরভুক জীব রূপে। জ্যোতির্ময়ীর সৃষ্ট শিক্ষিতা, স্বাবলম্বী নারীচরিত্রগুলি পরাশ্রয় ছেড়ে নিজস্ব স্থিতির বাসনাতে অস্থির হয়েছে। সুতারা, সুপ্রিয়া, বীনা, সুখমতিয়া, বিশাখা- এরা কেউই পুরুষের শত্রু নয়। এরা সকলেই নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে পুরুষকে ভালোবেসেছে। স্বামীর ঘর করতে যাওয়ার আগে তারা নিজ ভাগ্য নিজ স্বত্বে অর্জন করে নিয়েছে। ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও স্বামীর মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে সুপ্রিয়া ভেবেছে—

> "পুরুষমানুষের শ্রদ্ধা দয়া, মুষ্টিভিক্ষার প্রসাদ, নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদন ও চায় না। ওর তাদের দেওয়া ঐশ্বর্যের ওপর লোভ নেই, তাদের অর্জিত ধনের বিলাসশালার বিলাসের ওপর মোহ নেই, স্বজনরচিত পান্থশালায়- সম্পর্কের- পদভেদে কর্তৃত্বের মোহও ওর নেই"।[১৭]

এই স্বাধীনচেতা নারী চরিত্রগুলি এড়িয়ে গেছে অর্থলিপ্সু, নারীলোভী পুরুষদের। বিবাহের ক্ষেত্রেও তারা এমন পুরুষকে নির্বাচন করেছে, যাদের সঙ্গে আচার- ব্যবহারে, শিক্ষায়- রুচিতে তাদের মতের মিল হয়। যেমন 'ছায়াপথ' উপন্যাসের সুপ্রিয়া- বিভাস, 'মনের অগোচরে' উপন্যাসের যশোধরা- সুনন্দ পালিত, 'হরিজন উন্নয়ন কথা' উপন্যাসের সুখমতিয়া- হরভজন - এরা প্রত্যেকেই নিজের জীবনসঙ্গী কে নিজেই বেছে নিয়েছে। জাতপাত- ধর্মের বিচারে হয়তো এই মিলন অসবর্ণ হয়েছে।¢L¿¹¥ তারা জীবনে সুখী হয়েছে।

পাঁচটি উপন্যাসেই জ্যোতির্ময়ী দেবী সেই স্বাধীনচেতা নারীর খোঁজ করেছেন।

নারীজীবনের সহস্র সমস্যা অনুভব করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনে হয়েছিল, শিক্ষার গুণেই এই সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব। শিক্ষার গুণেই নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। তাঁর উপন্যাসের স্বাধীনচেতা নারীচরিত্রগুলি বেঁচেছে সতী হয়ে নয়, পত্নী হয়ে; বিপদে, সম্পদে পুরুষের সহচর হয়ে, জগতে মানুষ পরিচয়ে।

সূত্রনির্দেশঃ

১। 'নারীর কথা', জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন, ৪র্থ খন্ড, দেজপ্রকাশনী ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৩।
২। 'বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার'- সম্পাদনায় উমা মাজি মুখাপাধ্যায়, দেজ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা ১০৯।
৩। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, তৃতীয় খন্ড, দেজ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৫৮।
৪। ঐ পৃষ্ঠা ৭৩।
৫। ঐ পৃষ্ঠা ৭৮।
৬। 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা'- সুদক্ষিনা ঘোষ, দেজ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা ১৩৪।
৭। জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'বৈশাখের নিরুদেশ মেঘ', পৃষ্ঠা ৬৮।
৮। ঐ পৃষ্ঠা ৬৮।
৯। ঐ পৃষ্ঠা ১১২।
১০। 'মনের অগোচরে' জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন ২য় খন্ড, ১৯৯৪ দেজ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৫।

১১। জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্যে- অনামিকা চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা ৭৬।
১২। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংকলন, ১ম খন্ড, দেশ প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৯৫।
১৩। জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্যে- অনামিকা চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৪, পৃষ্ঠা ৮৪।
১৪। কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক- সম্পাদনায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য আশাদীপ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩০।
১৫। ঐ পৃষ্ঠা ৩০।
১৬। ঐ পৃষ্ঠা ৩১।
১৭। কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক- সম্পাদনায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আশাদীপ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩২।